প্রোগ্রামার

জামশেদ একজন প্রোগ্রামার। তার বয়স যখন ষোলো সে অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করেছিল, ইংরেজি আর ফিজিক্সে আর একটু হলে ভরাডুবি হয়ে যেত। দুই বছর পরে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আগে সে মোটামুটি পড়াশোনা করেছিল এবং হয়তো এমনিতেই পাস করে যেত। কিন্তু ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্যে ইংরেজি পরীক্ষায় দীর্ঘ রচনাটি নকল করতে গিয়ে পরীক্ষকের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। সে যে কলেজ থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানে উঁচু গলায় ছাত্র রাজনীতি করা হয়, শ্লোগানে-ঢাকা কলেজ ভবনটিকে দূর থেকে একটা খবরের কাগজের মতো মনে হয় এবং পরীক্ষার সময় পরীক্ষকরা নকলবাজ ছাত্রদের ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। কিন্তু জামশেদের কপাল খারাপ। সে একজন আধপাগল নীতিবাগীশ শিক্ষকের হাতে ধরা পড়ে গেল। যদিও সে নিরীহ গোছের মানুষ তবুও তার সন্ত্রাসী বন্ধুদের মতো ভয় দেখানোর চেষ্টা করে দেখল—তাতে কোনো লাভ হল না, বরং উল্টো খুব দ্রুত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে হস্তান্তর করে পাকাপাকিভাবে বহিষ্কার করে দেয়া হল।

জামশেদ মাসখানেক খুব মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াল। গভীর রাতে যখন আকাশে মেঘ করে ঝড়ো বাতাস বইত তখন মাঝে মাঝে তার সমস্ত জীবন অর্থহীন মনে হত; এমনকি এক-দুবার সে আত্মহত্যা করার কথা ও চিন্তা করেছিল। আত্মহত্যা করার কোনো যন্ত্রণাহীন সহজ পরিচ্ছন্ন উপায় থাকলে সে যে তার জন্যে সত্যি সত্যি চেষ্টা করে দেখত না এ কথাটিও কেউ নিশ্চিত করে বলতে যায় না। ঠিক এরকম সময়ে জামশেদ নয়াবাজারের মোড়ে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে প্রথমবারের মতো একটি কম্পিউটার দেখল।

ঘটনাটি যে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে সে সেটা তখনো জানত না। তার এক সহপাঠী যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রস্তুতি হিসেবে কম্পিউটারের ওপর কোর্স নেয়ার জন্যে এই ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে—তার সাথে সময় কাটানোর জন্যে সে এই ট্রেনিং সেন্টারে এসেছিল।

কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসে তাকে আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন কিছু কাজ করতে হচ্ছিল, কাজটি কেন করতে হচ্ছে কিছুতেই সে ব্যাপারটি ধরতে পারছিল না। অথচ দুই মিনিটের মাথায় হঠাৎ করে জামশেদের কাছে পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সহজ কাজ বলে মনে হতে থাকে। ঘণ্টা খানেকের মাঝে জামশেদ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সে তার সহপাঠীকে প্রোগ্রামিঙে সাহায্য করতে শুরু করেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটি বোঝা খুব সহজ নয়। জামশেদের ভিতরে হঠাৎ করে কম্পিউটার নামক এই বিচিত্র যন্ত্রটির জন্যে এক ধরনের অমানবিক আগ্রহের জন্ম হল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের নানা ধরনের কোর্সের কোনোটিই নেয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না এবং তার ভাইয়ের সংসারে ভাবির ফুটফরমাশ খেটে ট্রেনিং— সেটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। দিন কয়েক কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সে একরকম বেপরোয়া হয়ে একটা সাহসের কাজ করল— একদিন তার ভাবির একটা সোনার বালা চুরি করে ফেলল।

ঘটনাটি যে জামশেদ করতে পারে সেটি ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। বাসার কাজের ছেলেটিকে জামশেদের বড় ভাই—যিনি তাদের অফিসের ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন—অমানুষিকভাবে পেটালেন, তার পরেও স্বীকার না করায় তার জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের হাতে দ্বিতীয়বার নৃশংসভাবে পেটানোর জন্যে তুলে দিলেন।

পুরো ব্যাপারটিতে জামশেদের ভিতরে এক ধরনের গভীর অপরাধবোধ জন্ম হল, কিন্তু তবুও একটিবারও সোনার বালাটি ফিরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই কাজের ছেলেটিকে রক্ষা করার কথা মনে হল না। সোনার বালাটি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে কম্পিউটার নামক এই বিচিত্র জিনিসটির গহিনে প্রবেশ করার জন্যে তার ভিতরে যে দুর্দমনীয় আকর্ষণের জন্ম হয়েছে তার সাথে তুলনা করার মতো অন্য কোনো অনুভূতির সাথে সে পরিচিত নয়।

সোনার বালাটি যে মূল্যে বিক্রি করার কথা জামশেদকে তার থেকে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করতে হল, চোরাই জিনিস দেখেই কেমন করে জানি দোকানিরা বুঝে ফেলে। টাকাগুলো হাতে পেয়েই সে নয়াবাজারের মোড়ের কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী কোর্সে ভর্তি হয়ে গেল।

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারটির সাইনবোর্ডে অনেক বড় বড় এবং ভালো ভালো কথা লেখা থাকলেও এর প্রকৃত অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। একটি আধো অন্ধকার ঘিঞ্জিঘরে কিছু প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতির ভাইরাসদুষ্ট কম্পিউটার এবং একজন অশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। কোর্স চলাকালীন যখন অন্য ছাত্রেরা হোঁচট খেতে খেতে এক জায়গাতেই অন্ধের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন জামশেদ অপারেটিং সিস্টেমের বেড়াজাল পার হয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সৃজনশীল ভূখণ্ডে পা দিয়ে ফেলল। অর্ধশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর এই ব্যতিক্রমী ছাত্রকে পেয়ে প্রথমে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেও যখন আবিষ্কার করল সে তাকে আর প্রশ্ন না করে নিজে নিজেই কম্পিউটারের গহিনে প্রবেশ করে যাচ্ছে, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

তিন মাসের এই উচ্চাভিলাষী কোর্সের দ্বিতীয় মাসের দিকে জামশেদ আবিষ্কার করল এখানে তার শেখার মতো আর কিছুই বাকি নেই। যে স্বল্প সময় তাকে কম্পিউটারের সামনে বসতে দেয়া হয় সেটি তার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে করেই হোক তাকে এই রহস্যময় যন্ত্রটিকে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে পেতে হবে। যে পদ্ধতিতে সে এই কোর্সের ব্যয়ভার বহন করেছে সেই একই পদ্ধতিতে কম্পিউটার কেনা সম্ভব নয়, কিন্তু একটি কম্পিউটারকে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি না পেলে সে যে ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলতে পারে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

জামশেদের ভয়ানক কিছু করার প্রয়োজন হল না। কারণ তার একটি অভাবিত সুযোগ এসে গেল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের অর্ধশিক্ষিত ইন্সট্রাক্টর ভদ্রলোক স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি নিয়ে চলে গেল। ট্রেনিং সেন্টারের মালিক প্রায় এক ডজন নানা ধরনের ছাত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপদের মাঝে পড়ে গেলেন। ছাত্রদের সবাইও তাদের টাকা ফেরত দেয়ার দাবি করতে লাগল। ট্রেনিং সেন্টারের মালিক যখন কোর্স শেষ করার জন্যে পাগলের মতো একজন ইন্সট্রাক্টর খোঁজ করছিলেন তখন জামশেদ তাঁর কাছে কাজ চালিয়ে নেবার প্রস্তাব দিল। জামশেদের প্রস্তাব প্রথমে ট্রেনিং সেন্টারের মালিকের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হলেও জামশেদ কিছুক্ষণের মাঝে তার কাছে নিজের কর্মক্ষমতা প্রমাণ করে দিল। কোর্সের ছাত্রদের কাছে ব্যাপারটি গ্রহণ করানো অনেক বড় সমস্যা হিসেবে দেখা গেল। যে মানুষটি তাদের সাথে বসে একটা জিনিস শেখা শুরু করেছে এখন সে-ই তাদেরকে শেখাবে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তারা যখন আবিষ্কার করল আগের ইন্সট্রাক্টর নিজের ধোঁয়াটে জ্ঞানের কারণে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল এবং জামশেদ তাদেরকে সেই অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনছে—শুধু তাই নয়, কম্পিউটার জগতের নানা গলি-ঘুঁজির মাঝে কোনটিতে এখন প্রবেশ করা যায়, কোনটিতে উঁকি দেয়া যায় এবং আপাতত কোনটি থেকে দূরে থাকাই ভালো সে বিষয়টিও হাতে ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছে তখন জামশেদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার সীমা রইল না।

জামশেদের জীবনে তখন একটি বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটতে শুরু করল। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে তার কাছে অফিসঘরের চাবি থাকে। সে যখন খুশি অফিসে আসতে পারে এবং কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে পারে। মাসশেষে সে বেতন পেতে শুরু করল, সেই বেতনের টাকা দিয়ে সে তার বহুদিনের শখ একটি সানগ্লাস এবং প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের ওপর বই কিনে আনল। ইংরেজি বই পড়তে গিয়ে সে পদে পদে হোঁচট খেয়ে প্রথমবার যথেষ্ট ইংরেজি না জানার জন্যে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল।

জামশেদ প্যাস্কেল এবং সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে শুরু করে কিছুদিনের মাঝেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ঢুকে পড়ে এবং অন্যেরা যখন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের রুটিনবাঁধা নিয়মের রাস্তা ধরে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে চেষ্টা করতে থাকে তখন জামশেদ প্রোগ্রামিঙের অপরিচিত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী

ব্যাংক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে নানা ধরনের সফটওয়ার তৈরি করে দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দাবা খেলার একটা প্রোগ্রাম লিখল। প্রোগ্রামটি প্রচলিত সবগুলি দাবা খেলার সফটওয়ারকে হারিয়ে দেয়ায় জামশেদ অনেকটা নিশ্চিত হল— প্রোগ্রামিঙের জগতে সে মোটামুটি ঠিক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

কম্পিউটারের সাথে ঘনিষ্ঠতা হবার দুই বছরের মাঝে জামশেদের জীবনে তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল। একদিন ইংরেজি খবরের কাগজে সে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখতে পেল, প্রতিষ্ঠানটি তাদের একটি প্রজেক্ট শেষ করার জন্যে কয়েকজন প্রোগ্রামার খুঁজছে। বেতন এবং সুযোগ-সুবিধের বর্ণনা অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু জামশেদ আগ্রহী হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে প্রথম একটি সুপার কম্পিউটার স্থাপন করতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি যে ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা চাইছে জামশেদের তার কোনোটাই নেই, কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ল না। ছোট একটা ফ্লপি ডিস্কে ভারচুয়াল রিয়েলিটির তার প্রিয় একটা প্রোগ্রাম লিখে প্রতিষ্ঠানটির কাছে পাঠিয়ে দিল।

মনে মনে আশা করলেও প্রতিষ্ঠানটি যে সত্যি সত্যি তাকে প্রোগ্রামার হিসেবে গ্রহণ করবে সেটা জামশেদ বিশ্বাস করে নি। তাই যেদিন সুদৃশ্য খামে চমৎকার একটি প্যাডে জামশেদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি এসে হাজির হল জামশেদ সেটি অনেকবার পড়েও বিশ্বাস করতে পারল না—তার থেকে ভালো ইংরেজি জানে এরকম একজনকে দিয়ে পড়িয়ে তার ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে হল।

জামশেদ তার জমানো টাকা দিয়ে একটা স্যুট তৈরি করে তার নূতন কাজে যোগ দিল। অনেক খরচ করে তৈরি করা সেই স্যুটটি। জামশেদ অবশ্যি দ্বিতীয়বার পরে নি। কাজে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করল প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার ভুসভুসে একটা জিনসের প্যান্ট এবং রংওঠা বিবর্ণ একটা টি-শার্ট পরে কাজ করতে আসে। অন্য যারা রয়েছে তাদের সবারই ইচ্ছে করে অগোছালো এবং নোংরা থাকার একটা প্রবণতা রয়েছে। একমাত্র সুবেশী মানুষটি প্রতিষ্ঠানের একজন কেরানি এবং অন্যদের সামনে তাকে কেমন জানি হাস্যকর দেখায়।

কাজ বুঝে নিতে জামশেদের কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল। এতদিন সে যে ধরনের কম্পিউটারে কাজ করে এসেছে সেগুলি যে প্রকৃত অর্থে ছেলেমানুষি খেলনা ছাড়া আর কিছু নয় সেটি বুঝতে পেরে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রতিষ্ঠানটি যে এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটারটি বসিয়েছে তার অসংখ্য মাইক্রোপ্রসেসরকে শীতল করার জন্যেই বিশাল ফ্রিওন পাম্প প্রস্তুত রয়েছে। যদি কোনো কারণে হঠাৎ করে শীতল করা বন্ধ হয়ে যায় পুরো সুপার কম্পিউটারটি একটা বিস্ফোরকের মতো বিস্ফোরিত হয়ে যাবে সেটিও তার জানা ছিল না। এই বিশাল আয়োজন দেখে প্রথম প্রথম জামশেদ তার নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে একটু সংকুচিত হয়ে ছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মাঝেই তার নিজের ভিতরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানে তার মতো যারা আছে তাদের সবারই প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তার থেকে অনেক বেশি, কিন্তু কম্পিউটারে

প্রোগ্রামিঙের ব্যাপারে তার যেরকম ষষ্ঠ একটা ইন্দ্রিয় রয়েছে সেরকম আর কারো নেই—সেটা সে খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলল।

মাসের শেষে অবাস্তব একটি অঙ্কের প্রথম বেতন পেয়ে জামশেদ তার ভাবিকে একজোড়া সোনার বালা কিনে দিল। জামশেদের স্বল্পবুদ্ধি ভাবি ব্যাপারটিতে অভিভূত হয়ে গেলেন, কিন্তু তার পিছনে অন্য কোনো ইতিহাস থাকতে পারে সেটি তার কিংবা অন্য কারো একবারও সন্দেহ হল না। জামশেদ তার ভাইয়ের বাসার কাজের ছেলেটিকে অনেক খুঁজল। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে তার অকিঞ্চিৎকর জীবনে যে ভয়াবহ নৃশংসতা নেমে এসেছিল সেই অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সেই ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

বছর খানেকের মাঝে জামশেদ সুপার কম্পিউটারের আর্কিটেকচার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিল। প্রচলিত হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজগুলি তার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হতে থাকে বলে সে নিজের মতো একটি কম্পাইলার তৈরি করতে থাকে। কোনো একটি জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ না করেই সেটাকে যে সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে সেটা সবার কাছে যত আজগুবিই মনে হোক না কেন জামশেদ তার পিছনে লেগে রইল। বছর দুয়েক পর জামশেদ তার জন্যে নির্ধারিত কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে নিজের জন্যে প্রথম একটি কাজ সম্পূর্ণ করল। কম্পিউটারজগতের প্রচলিত ভাষায় সেটিকে ভারচুয়াল রিয়েলিটি বলা হলেও জামশেদ সেটিকে 'কল্পলোক' বলে অভিহিত করতে লাগল।

জামশেদের প্রোগ্রামটি সত্যিকার জগতের কাছাকাছি একটা কৃত্রিম জগৎ। "কল্পলোক" তৈরি করার জন্যে সে তার নিজের ঘরটি বেছে নিয়েছে। ঘরের বিভিন্ন অংশের ছবি নিয়ে সে ডিজিটাইজ করে নিয়ে তার প্রোগ্রামের মূল ভিতটি তৈরি করেছে। ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়ানো, একটা জানালা খুলে বাইরে তাকানো, দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে আসা, টেবিলের উপরে রাখা বই হাতে তুলে নেয়া—এরকম খুঁটিনাটি অসংখ্য কাজ সে প্রোগ্রামের মাঝে স্থান দিয়েছে। জামশেদ যে প্রতিষ্ঠানের জন্যে কাজ করছে তার প্রায় সবাই এই কল্পলোকে কখনো না কখনো ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জিএম বাকি ছিলেন, একদিন তিনিও দেখতে এলেন। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'শুনেছি তুমি আমাদের মেশিনকে বেআইনি কাজে ব্যবহার করছ!'

জামশেদ একটু থতমত খেয়ে বলল, "না মানে ইয়ে—যখন কেউ ব্যবহার করে না—"

জিএম ভদ্রলোক হা হা করে হেসে বললেন, "তুমি দেখি আমার কথা সিরিয়াসলি নিয়ে নিলে। কম্পিউটার চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখতে হয়—অথচ দশ পার্সেন্টও ব্যবহার করা হয় না! তুমি যদি নিজের কাজ শেষ করে অন্য কাজ কর কোনো সমস্যা নেই।"

"আমি নিজের কাজ শেষ করেই—"

"আমার সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে আঠার

ঘণ্টা কাজ করে তার নিজের কাজ শেষ হয়ে যাবারই কথা! এখন দেখি তোমার শখের কাজ।"

জামশেদ জিএম ভদ্রলোকের হাতে একটা হেলমেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা মাথায় পরতে হবে।"

ভদ্রলোক মাথায় পরে শিস দেবার মতো শব্দ করে বললেন, "করেছ টা কী! এ তো দেখছি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এটা বুঝি তোমার ঘর?"

"জি।"

"তুমি দেখি আমার থেকেও নোংরা। টেবিলে এতগুলি বই গাদাগাদি করে রেখেছ!"

"আপনি ইচ্ছে করলে একটা বই তুলতে পারবেন।"

জিএম মাথায় হেলমেট পরা অবস্থায় পরাবাস্তব জগতে কাল্পনিক একটা টেবিল থেকে কাল্পনিক একটা বই তুলে নিলেন। বইটা হাতে নিয়ে তার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, "কী আশ্চর্য! তুমি পুরোটা তৈরি করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"বইটা ছেড়ে দিলে কী হবে?"

"নিচে পড়বে।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

জিএম ভদ্রলোক তার হাতের পরাবাস্তব বইটি ছেড়ে দিতেই সেটি সশব্দে নিচে গিয়ে পড়ল।

জিএম ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। মাথা নেড়ে বললেন, "ফিজিক্স অংশটুকুও নিখুঁত, হাত থেকে পড়তে ঠিক সময়ই নিল দেখছি! প্রোগ্রাম করার জন্যে তোমাকে ফিজিক্স শিখতে হচ্ছে!"

জামশেদ হাসিমুখে বলল, "এস.এস.সি.তে আর একটু হলে ফেল করে ফেলেছিলাম। এইচ.এস.সি. তো দিতেই পারলাম না। তখন ব্যাপারগুলি বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি।"

"তাই হয়।' জিএম ভদ্রলোক ঘরের মাঝে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন, জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন, জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ ছিটকে পিছিয়ে এলেন, "মাকড়সা!"

জামশেদ হাসি হাসি মুখ করে বলল, "হ্যাঁ আমার ঘরে একটা গোবদা সাইজের মাকড়সা থাকে, ভাবলাম এখানে ঢুকিয়ে দিই।"

জিএম মাকড়সাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "পৃথিবীর এই একটা জিনিস আমি দু চোখে দেখতে পারি না।"

জামশেদের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনি ভয় পান?"

হ্যাঁ। ভয়, ঘেন্না এবং বিতৃষ্ণা। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, হাতপা শিরশির করতে থাকে। জিএম-এর মুখে এক ধরনের আতংকের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে, তিনি বিচিত্র

এক ধরনের গলায় বললেন, "নড়ছে, মাকড়সাটা নড়ছে!"

"হ্যাঁ, আপনি যদি ভয় দেখান শেলফের পিছনে লুকিয়ে যাবে।"

"আর আমি যদি ঝাঁটাপেটা করি তাহলে কি মরে যাবে?"

"হ্যাঁ, মরে যাবার কথা। পোকামাকড় মরে যাবার একটা ছোট প্রসেডিউর আছে।"

"আছে? তোমার ঘরে কোনো ঝাঁটা আছে?"

"ঝাঁটা নেই। টেবিলে খবরের কাগজ আছে, সেটাকে পাকিয়ে নিয়ে চেষ্টা করতে পারেন।"

জিএম অদৃশ্য একটি টেবিল থেকে অদৃশ্য একটা খবরের কাগজ নিয়ে সেটাকে পাকিয়ে একটা লাঠির মতো করে নিয়ে পায়ে পায়ে অদৃশ্য মাকড়সাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার মুখ শক্ত, শরীর টান টান হয়ে আছে। কাছাকাছি গিয়ে তিনি অদৃশ্য একটা মাকড়সাকে আঘাত করার চেষ্টা করে হঠাৎ লাফিয়ে পিছনে সরে এলেন। জামশেদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"বাগ! তোমার প্রোগ্রামে বাগ আছে।"

বাগ! জামশেদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, প্রোগ্রামিঙের সম্পূর্ণ নূতন একটা পদ্ধতি যে আবিষ্কার করেছে, এই পদ্ধতিতে প্রোগ্রামিঙে কোনো ত্রুটি—সাধারণ ভাষায় যেটাকে "বাগ" বলা হয় থাকতে পারে না। সে এগিয়ে বলল, "কী রকম বাগ?"

জিএম নিশ্বাস ফেলে বললেন, "মাকড়সাটা শূন্যে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে সেটা আমার দিকে আসছে। আসতে আসতে সেটা বড় হচ্ছে!"

"বড় হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, আর—আর—"

"আর কী?"

ঘরের দেয়াল, ছাদ, মেঝে থেকে মাকড়সা বের হয়ে আসছে—হাজার হাজার মাকড়সা, লক্ষ লক্ষ মাকড়সা—কিলবিল করছে—" জিএম একটা বিকট আর্তনাদ করে তার হেলমেটটি খুলে নিলেন, তার সারা মুখে একটা ভয়াবহ আতংকের ছাপ। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কী সাংঘাতিক!"

ঠিক এরকম সময় হঠাৎ একটা এলার্ম বাজতে শুরু করে এবং কয়েকজন টেকনিশিয়ান ছোটাছুটি শুরু করতে থাকে। জিএম ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"মেশিন ক্র্যাশ করেছে।"

"কীভাবে?"

"বুঝতে পারছি না। মেমোরি পার্টিশান ভেঙে গেছে।"

"কীভাবে ভাঙল?"

"বুঝতে পারছি না।"

জিএম জামশেদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "তোমার প্রোগ্রামের বাগ—"

"কিন্তু—আমি মেমোরি পার্টিশান করেছি রীতিমতো ফায়ারওয়াল দিয়ে।"

জিএম নিশ্বাস ফেলে বললেন, এক্স পি জি ক্রে ৩৯০ সুপার কম্পিউটার এত জটিল যে তার সঠিক আর্কিটেকচার কেউ জানে না। যারা তৈরি করেছে তারাও না।"

"আমি দুঃখিত। আমার জন্যে—"

"তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমাদের প্রজেক্ট হয়তো এক মাস পিছিয়ে যাবে, কিন্তু তুমি যেটা করেছ সেটা অবিশ্বাস্য, ঠিক কী কারণে মেমোরি পার্টিশান ভেঙেছে যদি বের করতে পার একটা বড় কাজ হবে। কে জানে ব্যাপারটা লাইসেন্স করে নিয়ে হয়তো বিলিয়ন ডলার একটা প্রজেক্ট ধরে ফেলতে পারব।"

সন্ধেবেলা জামশেদ হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছে। তার ব্যাংকে এখন অনেক টাকা, ইচ্ছে করলে সে একটা গাড়ি কিনতে পারে, এক জন ড্রাইভার রাখতে পারে—সেই গাড়িতে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু সে কিছুই করে নি। চব্বিশ ঘণ্টার সে আঠার ঘণ্টা কাজ করে—তার আনন্দ এবং বিষাদ সবকিছুই প্রোগ্রামিঙের যুক্তিতত্ত্বের মাঝে, তার বাইরে কোনো জগৎ নেই।

জামশেদ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দুপাশে বড় বড় বিল্ডিংগুলির দিকে তাকায়। আলোকোজ্জ্বল দোকানপাট, মানুষ যাচ্ছে এবং আসছে। রাস্তায় গাড়ি হর্ন দিতে দিতে হুসহাস করে ছুটে যাচ্ছে, চারদিকে একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম, যেন কোনো কৌশলী প্রোগ্রামারের তৈরী একটি ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রাম।

জামশেদ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে চমকে ওঠে। সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে? সত্যিই যদি এই জগৎ, এই আকাশ-বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, তাদের সভ্যতা, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আসলে একটি কৌশলী প্রোগ্রামারের তৈরী প্রোগ্রাম? জামশেদ মাথা থেকে চিন্তাটি সরাতে পারে না। সত্যি যদি এটি একটি প্রোগ্রাম সে কি কখনো সেটা জানতে পারবে? কোনো কি উপায় রয়েছে যেটা দিয়ে সে প্রমাণ করতে পারবে যে এটি কোনো অসাধারণ প্রতিভাবান ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মহাজাগতিক প্রাণীর কাল্পনিক জগৎ নয়? এটি সত্যি। এটি বাস্তব। কিন্তু বাস্তবতার অর্থ কী? এটি কি তার মস্তিষ্কের কিছু ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নয়? সেই সংজ্ঞাটা যে সত্যি সেটি সে কীভাবে প্রমাণ করবে? যে প্রোগ্রামার এই জগৎ তৈরি করেছে সে-ই কি এই মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনাও প্রোগ্রাম করে দেয় নি?

জামশেদের মাথা গরম হয়ে ওঠে। সে জোর করে তার মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়ার চেষ্টা করে, তার চারপাশে ঘুরে তাকায়। সামনে একটা বড় দোকানের সামনে কিছু কিশোর জটলা করছে। খালি পা, জীর্ণ প্যান্ট এবং বোতামহীন শার্ট—মাথায় উস্কখুস্ক চুল। জামশেদের হঠাৎ করে তার ভাইয়ের বাসার কাজের ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। ভাবির সোনার বালাটি চুরি করার পর তাকে যেরকম নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছিল দৃশ্যটি তার আবার মনে পড়ে যায়। ভাইয়ের শক্তপেটা শরীরের শক্তিশালী হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ঠোঁট থেঁতলে গিয়েছে, নাকমুখ রক্তে মাখামাখি, চোখ একটা বুজে গিয়েছে--জামশেদ জোর করে মাথা থেকে দৃশ্যটি সরিয়ে দেয়। তার জন্যে

এই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছেলেটির জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হল। কোথায় আছে এখন ছেলেটি?

জামশেদের ভিতরে প্রচণ্ড একটা অপরাধবোধ এসে ভর করে। সেই ছেলেটির সাথে দেখা হলে সে ছেলেটির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তার অপরাধের বোঝা লাঘব করে দিতে পারত। কিন্তু আর কখনো তার সাথে দেখা হয় নি। মনে মনে সে ছেলেটিকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু পৃথিবী বিশাল একটি ক্ষেত্র, সেখানে মানুষ অবলীলায় হারিয়ে যায়। কৌশলী কোনো এক প্রোগ্রামারের অসংখ্য রাশিমালার ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর একটি রাশি, মেমোরির তুচ্ছ একটি বিট।

জামশেদ একটা নিশ্বাস ফেলে সামনে তাকাল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে কখন লেকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করে নি। বিকেলবেলা জায়গাটি মানুষের ভিড়ে জনাকীর্ণ হয়ে থাকে, এখন মোটামুটি ফাঁকা। কাগজের ঠোঙা, বাদামের খোসা, সিগারেটের খালি প্যাকেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দৃশ্যটিতে কেমন যেন এক ধরনের নিঃসঙ্গ বিষণ্নতা লুকিয়ে আছে। জামশেদ কী মনে করে লেকের পাশে একটা বেঞ্চে বসল। সম্পূর্ণ অকারণে তার মনটি কেন জানি খারাপ হয়ে আছে।

"ভাই।" ...হঠাৎ করে গলার স্বর শুনে জামশেদ চমকে ঘুরে তাকাল। বেঞ্চের অন্যপাশে কে যেন বসে আছে, আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। জামশেদ ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কে?"

"আমি ভাই। আমাকে চিনতে পারছেন না?"

জামশেদ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, তার ভাইয়ের বাসার সেই কাজের ছেলেটি। নাক এবং মুখ থেঁতলে আছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। একটি চোখ বুজে আছে।

"তুই?"

"হ্যাঁ।"

"তু-তুই কোথা থেকে? তোর চেহারা এরকম কেন?"

"মনে নাই? আপনি বেগম সাহেবের সোনার বালা চুরি করলেন? তারপরে—"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি। তারপর সবাই আমাকে মিলে মারলেন। এই দেখেন সামনের দুইটা দাঁত ভেঙে গেছে—" ছেলেটি আবছা অন্ধকারে তার মুখ খুলে দেখানোর চেষ্টা করল, জামশেদ ভালো করে দেখতে পারল না।

জামশেদের সারা শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে ওঠে—এটি কি সত্যি? সে ভালো করে তাকাল, আবছা অন্ধকারে সত্যি সত্যি ছেলেটি বেঞ্চের অন্যপাশে বসে আছে। এত কাছে যে সে হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারবে। জামশেদ খানিকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে বলল, "তুই কোথা থেকে এসেছিস?"

ছেলেটি অনির্দিষ্টভাবে বলল, "হুই ওখান থেকে।"

"কেন?"

"আপনি আমার সাথে দেখা করতে চান সেই জন্যে।"
"তুই কেমন করে জানিস?"
ছেলেটি উদাস গলায় বলল, "আমি জানি।"

জামশেদ হঠাৎ হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারে। তার অনুমান সত্যি। এই সমস্ত জগৎ, আকাশ-বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আসলে একজন কৌশলী প্রোগ্রামারের সৃষ্টি। কোনো প্রোগ্রাম নিখুঁত নয়, তার ত্রুটি থাকে। ভারচুয়াল রিয়েলিটির প্রোগ্রামে ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটিতে স্পর্শ করামাত্র এক্স পি জি জে ৩৯০ সুপার কম্পিউটারের সমস্ত সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা ত্রুটি সযত্নে গড়ে তোলা জটিল একটা প্রোগ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশাল এই সৃষ্টিজগতের এই প্রোগ্রামেরও ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটিটি তার চোখের সামনে ধরা পড়েছে। তার বাসার কাজের ছেলেটি তার কাছে এসে বসে আছে। কোনো যুক্তি নেই, কোনো কারণ নেই, তবু সে চুপচাপ বসে আছে। এখন এই ত্রুটিটি স্পর্শ করলে কি এই প্রোগ্রামটিও ধ্বংস হয়ে যাবে?

জামশেদ আবার ঘুরে তাকাল, মনেপ্রাণে সে আশা করছিল সে তাকিয়ে দেখবে তার পাশে কেউ নেই, পুরোটা তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের একটা কল্পনা। কিন্তু সেটা সত্যি নয়, তার পাশে ছেলেটি বসে আছে। মুখ রক্তাক্ত, ঠোঁটটা কেটে গেছে, একটা চোখ বুজে আছে।

জামশেদ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, দেখতে পেল তার পাশে খুব ধীরে ধীরে দ্বিতীয় আরেকজন ছেলে স্পষ্ট হয়ে আসছে। হুবহু একই রকম চেহারা, স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশে আরেকজন। তার পাশে আরো অসংখ্য। হ্যাঁ, এটি একটি ত্রুটি। নিঃসন্দেহে প্রোগ্রামের একটি ত্রুটি।

জামশেদ চোখ বন্ধ করে ফেলল, না সে আর দেখতে চায় না। বিশাল এই প্রোগ্রামের ত্রুটিটি স্পর্শ করে পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দিতে চায় না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে, যেন একটু নড়লেই পুরো সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল সে জানে না। এক সময় সে চোখ খুলে তাকাল। চারদিকে অসংখ্য ছেলে, মুখ রক্তাক্ত, থেঁতলানো ঠোঁট, চোখ বুজে আছে যন্ত্রণায়। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা কি সত্যিই আছে নাকি একটা বিভ্রম? একবার কি ছুঁয়ে দেখবে?

স্পর্শ করবে না করবে না ভেবেও জামশেদ তার হাত এগিয়ে দিল ছোঁয়ার জন্যে......

*   *   *   *   *   *

কী হল?
পুরোটা আবার ধ্বংস হয়ে গেল।
আবার চালু করবে?
দীর্ঘ সময় নীরবতার পর কে যেন বলল, নাহ্! আর ইচ্ছে করছে না।